দৈনিক
জনকণ্ঠ

05 SEP 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ছাত্রলীগ আদর্শিক সংগঠন শিক্ষকের গায়ে হাত দিয়ে আমাদের লজ্জিত করল

মুহম্মদ শফিকুর রহমান

বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'ছাত্রলীগের ইতিহাস বাংলাদেশের ইতিহাস'। কেননা ছাত্রলীগ একটি আদর্শিক সংগঠন। একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ এবং লক্ষ্য নিয়ে তিনি ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি সংগঠনটির জন্ম দেন। সেই আদর্শ এবং লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে বাঙালী জাতির মুক্তি তথা বাঙালীর আপন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং তা তিনি সাফল্যের সঙ্গে অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই ছাত্রলীগ তাঁর রাজনৈতিক জীবনে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি প্রধান শক্তি।

ছাত্রলীগের জন্ম হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্যে। সেই থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা আন্দোলন; আইয়ুবের মিলিটারি শাসনবিরোধী আন্দোলন; ৬২-র হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন; '৬৬-র বাঙালী জাতির মুক্তিসনদ ৬ দফা আন্দোলন; ৬৯-এর ৬+১১ দফাভিত্তিক ছাত্র গণঅভ্যুত্থান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি; '৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়; '৭১-এর মার্চব্যাপী বঙ্গবন্ধুর নজিরবিহীন অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বিজয় অর্জন, এমনকি '৭৫-এর পর বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ ও জিয়া-এরশাদের মিলিটারি স্বৈরশাসন এবং খালেদা জিয়ার ছদ্মবেশী স্বৈরশাসনবিরোধী লড়াইয়ের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে-নির্দেশে সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তথা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা, প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রাম-আত্মত্যাগে ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ষাটের দশকের প্রথম দিকে তৎকালীন মিলিটারি আইয়ুবের বশংবদ গবর্নর মোনায়েম খাঁর গুণ্ডাবাহিনী এনএসএফ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানীয় শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছিল তখনও ছাত্রলীগ রুখে দাঁড়িয়েছিল, এনএসএফের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করেছিল। মোটকথা, বিগত ৬৮ বছরে বাঙালী জাতির প্রতিটি সংগ্রামে ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সেই আদর্শিক ছাত্রলীগ আজ যখন সম্মানীয় শিক্ষকের গায়ে হাত তোলে তখন কেমন যেন গোলমেলে মনে হয়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। তবে কি ছাত্রলীগ আজ আদর্শচ্যুত? লক্ষ্যভ্রষ্ট? আমরা যারা সেই ষাটের দশক থেকে ছাত্রলীগকে দেখছি, নিজেরাও ছোটখাটো কর্মী ছিলাম, আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিয়েছি, মুক্তিযুদ্ধ করেছি, আমাদের চেহারায়ও কালিমালিপ্ত করল ছাত্রলীগ।

সর্বোপরি যে নেত্রী মা-বাবা, ভাই-ভ্রাতৃবধু, চাচাসহ আপনজনের বিয়োগকষ্ট আমলে না নিয়ে পিতার মতোই জাতির স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে দিবারাত্রি কাজ করে চলেছেন, ছাত্রলীগের এ সব অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ড তাঁকেও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে নিয়ে গেছে। তাঁর কাছে কি জবাব দেবে ছাত্রলীগ নেতারা? নেত্রী একটি 'তলাবিহীন ঝুড়ির' দেশকে 'উপচেপড়া শস্যভাণ্ডারের দেশে' পরিণত করলেন, সকল প্রকার বাধা, চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করলেন, MGD সহ উন্নয়নের সুফল সূচকে বাংলাদেশ যখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে দেশকে পাপমুক্ত করলেন, আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক মানবাধিকারের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং কাণ্ডারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বিশ্বব্যাপী নন্দিত রাষ্ট্রনায়ক, তখন ছাত্রলীগের শিক্ষকলাঞ্ছনা, নিজেদের মধ্যে আধিপত্যের লড়াই, গোলাগুলি ইত্যাদি দেশে-বিদেশে কি বার্তা দিচ্ছে? নিশ্চয়ই সুখকর বার্তা নয়। কম দুঃখে শেখ হাসিনা 'ছাত্রলীগের আগাছা সাফ' করার নির্দেশ প্রদান করেননি।

আমি এখনও বিশ্বাস করি আদর্শিক ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শিক্ষকের গায়ে হাত দেয়ার মতো বেআদবি করতে পারে না। এ যে পাপ! জন্মলগ্ন থেকে বিগত ৬৮ বছর সংগঠনটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে, ১৯৭৫ সালের দুঃখজনক ঘটনার পর বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশে ও নেতৃত্বে কাজ করছে, সেই ছাত্রলীগ এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটাতে পারে না! কোথায় একটা গলদ নিশ্চয়ই আছে এবং তাও ছাত্রলীগকেই দূর করতে হবে। ছাত্রলীগের গৌরবগাথা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তবু দুটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই : ১. বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। অন্যভাবে বললে বলতে হয় ব্রিটিশ বেনিয়াদের তাড়ানোর আন্দোলনে কলকাতাকেন্দ্রিক ছাত্রনেতা হিসেবে নেতৃত্বও দিয়েছেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগস্টে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে লর্ড মাউন্টবেটেন, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, মহাত্মা গান্ধী, জওয়াহেরলাল নেহরুরা যেভাবে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত করে ভারত ভাগ করলেন এবং ভারতের বিপরীতে পাকিস্তান নামের এক অবাস্তব রাষ্ট্র জন্ম দিলেন সেদিনের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান মেনে নিতে পারেননি। তাই ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমান মওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ) থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী নিয়ে ঢাকায় এলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর. আইন বিভাগে ভর্তি হলেন। বঙ্গবন্ধু যখন কলকাতা বেকার হোস্টেল থেকে ঢাকার পথে রওয়ানা দেন তখন সহপাঠীদের বলেছিলেন, এ স্বাধীনতা পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য নয়, আমাদের তাই বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য বাঙালীর আপন জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করতে হবে। সেজন্যই ঢাকা যাচ্ছি। ঢাকায় এসেই বঙ্গবন্ধু 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের' প্রতিষ্ঠা করেন, যা স্বাধীনতার পর 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ' হলো। এরপর যুক্তফ্রন্ট হলো, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তিনিও জিতলেন, মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন; কিন্তু সেদিনের পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র এতটুকু পাল্টাল না, বরং আটান্ন সালে মার্শাল ল' দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ধারায় কুঠারাঘাত করা হলো। তখন বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। অর্থাৎ আপোসহীন গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি আন্ডারগ্রাউন্ড সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা যোগ হয়। (জাতির দুর্ভাগ্য বঙ্গবন্ধুর সেই 'আপোসহীন' নেতৃত্ব ও 'জাতীয়তাবাদী আন্দোলন' মিলিটারি জিয়া বা তদীয় পত্নী সেমি মিলিটারি ধারার খালেদা জিয়ার গায়ে পরিয়ে দেয়া হলো।) এবং ষাটের দশকের প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধু 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন গড়ে তোলেন, যেটি মূলত ছিল একটি সশস্ত্র সংগঠন এবং এর দায়িত্ব দেয়া হয় কাজী আরেফ আহমেদ, সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখকে। পরবর্তীতে আরও অনেকে এতে যুক্ত হন বলে শুনেছি। জেনে রাখা ভাল, এরা সবাই ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন।

২. বাঙালীর মুক্তিসনদ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফা দেয়ার পর যখন বঙ্গবন্ধুসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে গ্রেফতার করা হলো এবং বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে হত্যার জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দেয়া হলো, তখন এই ছাত্রলীগই রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং ৬ দফার ভিত্তিতে ছাত্র সমাজ ১১ দফা দাবি উত্থাপন করে গণঅভ্যুত্থান শুরু করে, যা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে ইতিহাসে খ্যাত। ঐ ১১ দফা আন্দোলনের ফলেই বঙ্গবন্ধু আইয়ুবের কারাগার থেকে মুক্ত হন। আইয়ুবকেও আরেক মিলিটারি জল্লাদ ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে যেতে হয়। সেই ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের নায়করাও ছিলেন ছাত্রলীগের। যেমন তোফায়েল আহমদ, আবদুর রউফ, খালেদ মুহম্মদ আলী, মমতাজ বেগম, রাফিয়া আখতার ডলি, নূরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ। মস্কো এবং পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা, যেমন রাশেদ খান মেনন, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, শামসুজ্জোহা, মালেকা বেগম, দীপা দত্ত, মাহবুবুল্লাহও ছিলেন ঐ আন্দোলনে।

৩. একাত্তরের বঙ্গবন্ধুর ডাকে, নেতৃত্বে ও আদর্শে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নিয়মিত বাহিনীর (আর্মি, পুলিশ, তৎকালীন ইপিআর, আনসার) পাশাপাশি যে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা হয় তার নাম ছিল BLF বা মুজিব বাহিনী, উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে গোটা বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ করে। এই বাহিনীর শীর্ষ চার নেতা ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতা ছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন ও শাজাহান সিরাজ-এরাও সবাই ছাত্রলীগ নেতা ছিলেন।

ছাত্রলীগের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাগুলো এজন্য উদ্ধৃত করলাম যে, আজকের প্রজন্মের ছাত্রলীগ বিশেষ করে ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার পর এবং ১৯৮১ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা প্রবাস জীবন থেকে ফিরে বাংলাদেশের মূলধারার রাজনীতির হাল ধরার পর থেকে যারা ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, তাঁরাও লড়াই করছেন। ছাত্রলীগের আদর্শিক লড়াই। তারপরও বলব, ছাত্রলীগের ঐতিহাসিক লড়াইগুলো সবার মনে রাখা দরকার এজন্য যে, আগেই বলেছি, আমরা যারা ৪৪ বছর আগে ছাত্রলীগের নগণ্য কর্মী ছিলাম আমাদের লজ্জা হয় যখন শুনি ছাত্রলীগ শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছে বা নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করছে তখন বিশ্বাস করতে মন চায় না। এখনও বিশ্বাস করি না সত্যিকারের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা কোন অপকর্ম করতে পারে। তাহলে কারা করছে? কে দায়ী?

তাহলে কি নেতৃত্বের দুর্বলতা? তাহলে কি নেতা ও কর্মীদের মধ্যে দূরত্ব? তাহলে কি নেতৃত্বের মধ্যে বিলাসী জীবনযাপন? তাহলে কি সুশিক্ষার অভাব? তাহলে কি নৈতিক অবক্ষয়? তাহলে কি আদর্শচ্যুতি? তাহলে কি লক্ষ্যভ্রষ্টতা? তাহলে কি কোন শিক্ষকের স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়া?

আমি সর্বশেষ প্রশ্নটির ওপর গুরুত্ব দিতে চাই। সম্প্রতি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের একটি অংশ যখন আন্দোলন করছিলেন তখন ছাত্রলীগের কিছু কর্মী তাদের লাঞ্ছিত করে, অপমান করে এবং আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মধ্যে প্রখ্যাত লেখক ও তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. জাফর ইকবালের সহধর্মিণী প্রফেসর ড. ইয়াসমিন হকও ছিলেন এবং লাঞ্ছিত হয়েছেন। এটি কি ছাত্রলীগ কর্মীদের প্রয়োজন ছিল? অবশ্য সাম্প্রতিককালে প্রায়শ দেখা যায় যখনই উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় তখন শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে বিচ্যুতি দেখা দেয়। যে কারণে ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক ড. জাফর ইকবালও বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শহীদ মিনারে বসে প্রতীকী প্রতিবাদ করলেন। তারপর যখন ছাত্রলীগের কয়েকজনকে সংগঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হলো তখন (বুধবার) ক্যাম্পাসে সংবাদ সম্মেলন করে ড. জাফর ইকবাল বললেন, 'ছাত্রলীগের কোন দোষ নেই, ওদের শাস্তি দেয়া অন্যায়' (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার)। তিনি ছাত্রলীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ায় কষ্ট পেয়েছেন। বললেন, 'শিক্ষকদের ওপর কে হামলা করেছে? ছাত্রলীগের ছেলেরা? না, এরা তো ছাত্র। কম বয়েসী ছেলে। এরা কি বুঝে? ওদেরকে আপনি যাই বোঝাবেন তাই বুঝবে। আমি যখন দেখলাম যে, চারজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে, এখন লিটারেলি ওদের জন্য আমার মায়া হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য 'ছাত্রলীগের আগাছা সাফ করতে হবে'- এ প্রসঙ্গে জাফর ইকবাল বলেন, 'এরা আমাদের ছাত্র। এদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে, ওদের সঙ্গে কথা বলে, ওদের ঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে পারব। আগাছাকে আমরা ফুল গাছে পরিণত করব। এটা সম্ভব।'

আমি প্রফেসর ড. জাফর ইকবালের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলতে চাই, কেন আদর্শিক ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ অছাত্র কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। দেখা যায় রাজনীতিতে ব্যর্থ এমন নেতারা দলে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে নিচের দিকে সুযোগ সন্ধানীদের দলে ভেড়ায়। তারা ওই নেতাদের নামে স্লোগান দেয়। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে অর্থযোগও থাকে। এই সুযোগ সন্ধানীরা যখন আদর্শিক ছাত্রলীগকে ব্যবহার করতে পারে না তখন ওদের কমিটি বাতিল করে দেয় এবং ওপরের দিকে হাত লম্বা করে গুন্ডা-পান্ডা অছাত্র দিয়ে কমিটি গঠন করে। এরা জনপ্রতিনিধি হলেও এলাকায় যেতে সামনে ছাত্র নামধারী হুণ্ডায় অছাত্র গুন্ডা ও পেছনে পুলিশের গাড়ি নিয়ে নিজ এলাকায় চলাফেরা করেন। যার পুলিশের প্রটেকশন পাবার কথা নয় সেও ওপরের দিকে হাত লম্বার কারণে পুলিশ নিয়ে ঘোরে। এভাবেই অছাত্র ছাত্র হয়, আদর্শিক ছাত্রলীগ পরিণত হয় ষণ্ডা ছাত্রলীগে। আমিও ড. জাফর ইকবালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই, কতিপয় ছাত্রলীগ নামধারী ষণ্ডা বা অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত ছাত্রলীগ নামধারীর জন্য আদর্শিক ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করা ঠিক হবে না। বরং মূল সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের আগাছা দূর করা একান্ত জরুরী।

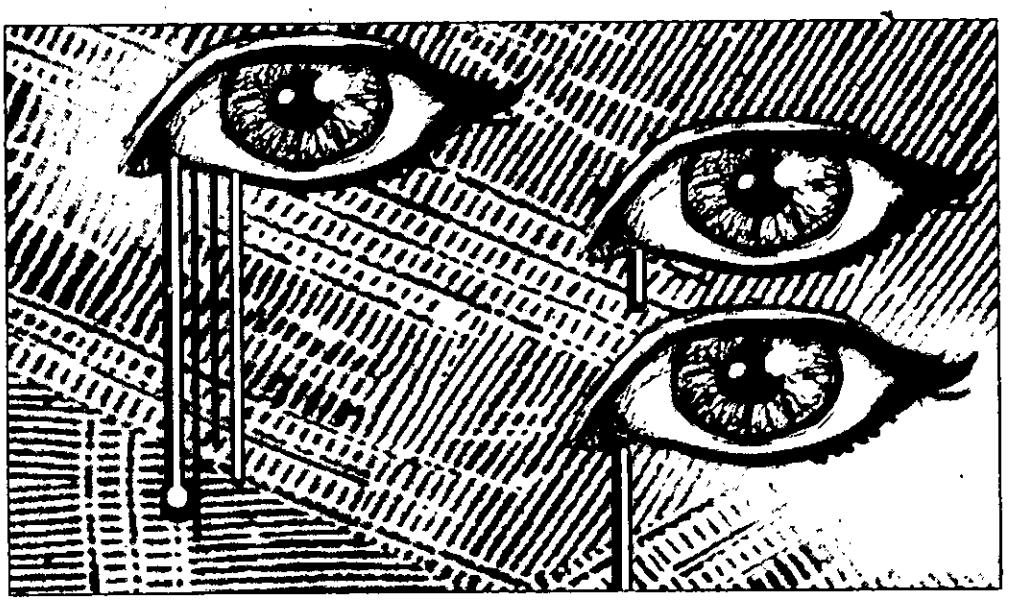

ঢাকা- ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব

আমিও ড. জাফর ইকবালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই, কতিপয় ছাত্রলীগ নামধারী ষণ্ডা বা অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত ছাত্রলীগ নামধারীর জন্য আদর্শিক ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করা ঠিক হবে না। বরং মূল সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের আগাছা দূর করা একান্ত জরুরী